কৃষিই সমৃদ্ধি

প্রশিক্ষণ সিডিউল ও প্রশিক্ষণ বার্তা

জুলাই/২০২৩

উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়

বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রশিক্ষণ সিডিউল- ০১

তারিখঃ ০৪ জুলাই, ২০২৩

সাপ্তাহিক কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ সেশনের রুপরেখা

সময়	বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১০.০০-১১.০০	গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রহ/ছকপত্র/নির্দেশনা প্রদান, বিগত/বর্তমানে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংশোধন এবং অতন্দ্রজরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।	এইও/ এএইও/ এসএপিপিও
১১.০০-১১.৩০	বিভিন্ন প্রকল্প/বিশেষ কর্মসূচী/গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশনা প্রদান, বিগত সপ্তাহের ট্র্যর নোট উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা।	ইউএও/ এইও
১১.৩০-১২.৩০ প্রথম ক্লাস	সরিষার আবাদ বাড়িয়ে ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণ	ইউএও
১২.৩০-১.০০ দ্বিতীয় ক্লাস	আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করনীয়	এইও
১.০০-২.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	
২.০০-২.৩০ তৃতীয় ক্লাস	জৈব বালাইনাশক ও এর ব্যবহার	এসএপিপিও
২.৩০- ৩.০০ চতুর্থ ক্লাস	ধানের পামরি পোকা দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
৩.০০-৪.০০ পঞ্চম ক্লাস	বস্তায় আদা চাষ পদ্ধতি	এইও

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রশিক্ষণ সিডিউল- ০২

তারিখঃ ২০ জুলাই, ২০২৩

সাপ্তাহিক কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ সেশনের রুপরেখা

সময়	বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১০.০০-১১.০০	গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রহ/ছকপত্র/নির্দেশনা প্রদান, বিগত/বর্তমানে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংশোধন এবং অতন্দ্রজরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।	এইও/ এএইও/ এসএপিপিও
১১.০০-১১.৩০	বিভিন্ন প্রকল্প/বিশেষ কর্মসূচী/গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশনা প্রদান, বিগত সপ্তাহের ট্র্যর নোট উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা।	ইউএও/ এইও
১১.৩০-১২.৩০ প্রথম ক্লাস	দেশি ফল চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা	ইউএও
১২.৩০-১.০০ দ্বিতীয় ক্লাস	মাল্টা বাগানের পরিচর্যা	এইও
১.০০-২.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	
২.০০-২.৩০ তৃতীয় ক্লাস	পেয়ারার এনথ্রাক্সনোজ বা ক্ষত রোগ দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
২.৩০-৩.০০ চতুর্থ ক্লাস	পেয়ারার মাছি পোকা ও স্কেল/খোসা পোকা দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
৩.০০-৪.০০ পঞ্চম ক্লাস	উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি ও এর অভাবজনিত লক্ষণসমূহ	এইও

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সরিষার আবাদ বাড়িয়ে ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণ

'স্বল্পমেয়াদের আমন আর বোরো মাঝে উচ্চফলনশীল সরিষা করো, তেলের অভাব ফুরিয়ে যাবে গোলাভরা ধানও পাবে।'

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, 'আগামী তিন বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদার চল্লিশ বাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে।' ধানের উৎপাদন না কমিয়ে মাঝারি উঁচু বা উঁচু জমিতে উচ্চফলনশীল এবং স্বল্পমেয়াদি আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে খুব সহজেই সরিষা চাষ করে প্রয়োজনীয় ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটানো যায়। এজন্য দরকার সঠিক সময়ে সঠিক জাতের আমন, সরিষা ও বোরো ধানের চাষাবাদ।

ধানের আবাদ না কমিয়ে সরিষার আবাদ বাড়ানোর কার্যকর শস্যবিন্যাস

আমন ধানের জাত ও রোপণের সময়

অধিক ফলনশীল স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন জাতসমূহ : ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৪, ব্রি হাইব্রিড ধান৬, বিনাধান-১৬, বিনাধান-১৭, বিনাধান-২২

রোপণের সময় : আষাঢ়ের মাঝামাঝি/জুলাইয়ের শুরুতে আমন ধানের বীজতলা তৈরি করে ২৫ দিনের চারা মূল জমিতে রোপণ করলে উপযুক্ত সময়ে সরিষা চাষ করা যাবে।

বি.দ্র. উত্তরবঙ্গে আমনের চারা ১০-১৫ দিন আগে রোপণ করতে হবে নতুবা আমন ধান চিটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সরিষা জাত ও রোপণের সময়

স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন সরিষার জাতসমূহ : বিনা সরিষা-৪, বিনা সরিষা-৯, বিনা সরিষা-১০, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৭।

রোপণের সময় : ০১ নভেম্বর/১৬ কার্তিকের মধ্যে সরিষার বীজ বপন করা উত্তম তবে ১৫ নভেম্বর/৩০ কার্তিক পর্যন্ত সরিষার বীজ বপন করা যেতে পারে।

বোরো ধানের জাত ও রোপণের সময়

অধিক ফলনশীল স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন বোরো জাতসমূহ : ব্রি ধান৬৩, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৬৮, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৪, ব্রি ধান৮৬, ব্রি ধান৮৮, ব্রি ধান৯৬, বঙ্গবন্ধু ধান১০০, ব্রি হাইব্রিড ধান২, ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ব্রি হাইব্রিড ধান৫, বিনাধান-১০, বিনাধান-২৪, বিনাধান-২৫

রোপণের সময় : ডিসেম্বরের মাঝামাঝি/পৌষের শুরুতে বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ/মাঘের শেস সপ্তাহের মধ্যে ৩৫-৪০ দিনের চারা রোপণ করা যাবে।

বি.দ্র. উত্তরবঙ্গে বোরোর চারা ১০-১৫ দিন দেরিতে রোপণ করতে হবে নতুবা বোরো ধান চিটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করনীয়

আমন মৌসুমে যেহেতু আবাদ এলাকা সম্প্রসারণের তেমন সুযোগ নেই তাই ফলন বাড়ানোর জন্য নতুন জাত চাষাবাদের সঙ্গে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি। আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয় যেমন- ভালো বীজ নির্বাচন, জমি তৈরি, সঠিক সময়ে বপন বা রোপণ, আগাছা দূরীকরণ, সার ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা ও সম্পূরক সেচ ফলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জাত নির্বাচন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমন মৌসুম ও এর পরিবেশ উপযোগী ৪১টি (৩৯টি ইনব্রিড ও ২টি হাইব্রিড) উফশী ধানের জাত ও ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানা রকম কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছে। অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে চাষযোগ্য আমন জাতগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

অনুকূল পরিবেশ উপযোগী জাতসমূহ : বিআর৪, বিআর৫, বিআর১০, বিআর১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭।

প্রতিকূল পরিবেশে চাষযোগ্য জাত : খরাপ্রবণ এলাকায় ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭ ও ব্রি ধান৬৬, ব্রি ধান৭১ বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী জাতগুলো হলো- ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭৯। এছাড়া বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৪৬ জাতগুলোর নাবি গুণ থাকার জন্য এদের বীজ ২০-৩০ শ্রাবণে বপন করে ৩০-৪০ দিনের চারা সর্বশেষ ৩১ ভাদ্র পর্যন্ত বন্যা প্রবণ এলাকায় রোপণ করা যায়।

লবণাক্ত এলাকায় বিআর২৩, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪, ব্রি ধান৭৩, ব্রি ধান৭৮। জোয়ার-ভাটা প্রবণ অলবণাক্ত এলাকার উপযোগী জাতগুলো হলো- ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭৬,ব্রি ধান৭৭ জলাবদ্ধ এলাকার জন্য উপযোগী জাত- বিআর১০, বিআর২৩, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৭৬, ব্রি ধান৭৮ বরেন্দ্র এলাকার জন্য জাতগুলো হলো- ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬৬, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫, ও ব্রি ধান৮০। এছাড়া সুগন্ধি ব্রি ধান৩৪ সহ সমতল বরেন্দ্র অঞ্চলে অনুকূল পরিবেশের জন্য সুপারিশকৃত সব জাতই চাষ করা সম্ভব।
পাহাড়ি এলাকার জন্য উপযোগী জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে- ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫, এবং ব্রি ধান৮০। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জাত : দিনাজপুর, নওগাঁসহ যেসব এলাকায় সরু বা সুগন্ধি ধানের চাষ হয় সেখানে বিআর৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮,ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭৫ ও ব্রি ধান৮০ চাষ করা যায়। ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাত : আমন মৌসুমের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতগুলো হলো ব্রি হাইব্রিড ধান৪ ও ৬। এ জাতগুলো বন্যামুক্ত এলাকায় রোপা আমনে অনুকূল পরিবেশে চাষযোগ্য। এ জাতগুলোর চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা এবং লম্বা, ভাত ঝরঝরে হওয়ায় কৃষকের কাছে পছন্দনীয়।

নতুন উদ্ভাবিত আমনের জাত ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৮০ এবং ব্রি ধান৮৭ জাতগুলো চাষ করে প্রতিনিয়ত উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। আবার জীবনকাল অনুসারে জাতগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যম মেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি জাত হিসেবে ভাগ করা যায়। দীর্ঘমেয়াদি জাত (জীবনকাল ১৩৫ দিনের বেশি), যেমন- বিআর১০, বিআর১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৫১। মধ্যম মেয়াদি জাত (জীবনকাল ১২০-১৩৫ দিন), যেমন- বিআর২৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭। স্বল্পমেয়াদি জাত (জীবনকাল ১২০ দিনের কম), রবি ফসল এলাকায় স্বল্পমেয়াদি জাত যেমন- ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৬, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫ চাষ করে সহজেই ধান কাটার পর রবি ফসল করা যাবে।

বীজতলা তৈরি ও বীজ বপনের সময় : উঁচু এবং উর্বর জমিতে বীজতলা তৈরি করতে হবে যেখানে বন্যার পানি উঠার সম্ভাবনা নেই। যেসব এলাকায় উঁচু জমি নেই সেসব এলাকায় ভাসমান বীজতলা তৈরি করার জন্য পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প জীবনকালের জাতের জন্য আলাদা আলাদা স্থান ও সময়ে বীজতলায় বপন করতে হবে। পরিমিত ও মধ্যম মাত্রার উর্বর মাটিতে বীজতলার জন্য কোনো সার প্রয়োগ করতে হয় না। তবে নিম্ন, অতি নিম্ন অথবা অনুর্বর মাটির ক্ষেত্রে গোবর অথবা খামারজাত সার প্রতি শতকে ২ মণ হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। ভালো চারা পাওয়ার জন্য ভালো বীজের বিকল্প নেই। তাই বিএডিসি, স্থানীয় কৃষি বিভাগ বা ব্রি কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ভালো বীজ সংগ্রহ করে বীজতলায় বপন করতে হবে।

আমন বীজতলায় রোগ ব্যবস্থাপনা : আমন বীজতলায় বাকানি রোগ দেখা দিতে পারে। বাকানি রোগাক্রান্ত ধানের চারা হালকা সবুজ, লিকলিকে ও স্বাভাবিক চারার চেয়ে অনেকটা লম্বা হয়ে অন্য চারার ওপরে ঢলে পড়ে। আক্রান্ত চারাগুলো ক্রমান্বয়ে মারা যায়। আক্রান্ত চারার নিচের গিট থেকে অস্থানিক শিকড়ও দেখা যেতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা : বাকানি রোগ দমনের জন্য অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউপি বা নোইন দ্বারা বীজ অথবা চারা শোধন করতে (১ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউপি বা নোইন মিশিয়ে তাতে ধানের বীজ অথবা চারা ১০-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা) হবে। আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বীজতলা হিসেবে একই জমি ব্যবহার না করা।

চারা রোপণ : লাইন বা সারিবদ্ধভাবে চারা রোপণ করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো ও বাতাস চলাচলের জন্য উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সারি করে লাগালে ভালো। সাধারণত সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) ও গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি) রাখলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে। তবে জমি উর্বর হলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সে.মি. (১০ ইঞ্চি) ও গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫ সে.মি. (৬ ইঞ্চি) রাখা যেতে পারে।

চারার বয়স : আলোক-অসংবেদনশীল দীর্ঘ ও মধ্যম মেয়াদি জাতগুলোর চারার বয়স হবে ২০-২৫ দিন। আলোক-অসংবেদনশীল স্বল্পমেয়াদি জাতগুলোর চারার বয়স হবে ১৫-২০ দিন। ধান৪১, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪, ব্রি ধান৭৩ চারার বয়স হবে ৩০-৩৫দিন।

আলোক-সংবেদনশীল জাতগুলোর (যেমন : বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৭৬, ব্রি ধান৭৭) নাবিতে রোপণের ক্ষেত্রে চারার বয়স হবে ৩৫-৪০দিন।

রোপণ সময় : রোপা আমনের আলোক-অসংবেদনশীল দীর্ঘ ও মধ্যম মেয়াদি জাতগুলোর উপযুক্ত রোপণ সময় হচ্ছে ১৫ জুলাই-১৫ আগস্ট। তাছাড়া প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ফলন কমে যাবে। আলোক-অসংবেদনশীল স্বল্পমেয়াদি জাতগুলোর উপযুক্ত রোপণ সময় হচ্ছে ২৫জুলাই-২৫আগস্ট। এই সময়ের আগে লাগালে ইঁদুর ও পাখি আক্রমণ করে।

আলোক-সংবেদনশীল জাতগুলোর (বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৫৪, নাইজারশাইল) বপন সময় হলো ৩০ আগস্ট পর্যন্ত এবং রোপণ সময় হচ্ছে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সকল সুগন্ধি এবং স্থানীয় জাত ১-২০ভাদ্র (মধ্য আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ) সময়ের মধ্যে রোপণ করতে হবে।

সম্পূরক সেচ : আমন চাষাবাদ পুরোটাই বৃষ্টি নির্ভর। তবে প্রতি বছর সকল স্থানে বৃষ্টিপাত এক রকম হয় না। এমনকি একই বৎসরের একই স্থানে সবসময় সমানভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। আমন মৌসুমে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০% হয়ে থাকে, যা আমন আবাদের জন্য যথেষ্ট। তবে আমনের বৃষ্টিপাত সময়মতো না হলে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। বৃষ্টি-নির্ভর ধানের জমিতে যে কোন পর্যায়ে সাময়িকভাবে বৃষ্টির অভাবে খরা হলে অবশ্যই সম্পূরক সেচ দিতে হবে। প্রয়োজনে সম্পূরক সেচের সংখ্যা একাধিক হতে পারে। তা না হলে ফলনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

সার ব্যবস্থাপনা : আবহাওয়া ও মাটির উর্বরতার মান যাচাই এবং ধানের জাত, জীবনকাল ও ফলন মাত্রার উপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা ঠিক করা হয়। আলোক-অসংবেদনশীল দীর্ঘ ও মধ্যম মেয়াদি জাতের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ইউরিয়া-ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম যথাক্রমে ২৬-৮-১৪-৯ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত-এমওপি-ডিএপি/টিএসপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

আলোক-অসংবেদনশীল স্বল্পমেয়াদি জাতের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ইউরিয়া-ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম যথাক্রমে ২০-৭-১১-৮ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির শেষ চাষে ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমানভাগে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। নাবিতে রোপণকৃত আলোক-সংবেদনশীল জাতের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ইউরিয়া-ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম যথাক্রমে ২৩-৯-১৩-৮ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির শেষ চাষে ২/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। ব্রি ধান৩২ এবং স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল সুগন্ধিজাত যেমন- বিআর৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭ ও ব্রি ধান৩৮ ধানের ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ইউরিয়া-ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম যথাক্রমে ১২-৭-৮-৬ কেজি হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

* ডিএপি সার ব্যবহার করলে সবক্ষেত্রেই প্রতি কেজি ডিএপি সারের জন্য ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে এতে গাছ শক্ত হয়, রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

সাশ্রয়ী সার ব্যবহারে কয়েকটি প্রযুক্তি : আমরা জানি, উদ্ভিদের নাইট্রোজেন এর অভাব পূরণে জমিতে ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের জৈব সার (যেমন-সবুজ সার, আবর্জনা পচা সার, পচা গোবর), নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়াল ইনোকুলাম প্রয়োগ এবং অ্যাজোলার চাষ বাড়ানো যেতে পারে। ব্রি'র তথ্য মতে, দুই সেমি পর্যন্ত পানিযুক্ত কাদা মাটিতে গুটি ইউরিয়া ও প্রিল্ড ইউরিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় হয়। তবে জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। অন্যদিকে ডাই এমোনিয়াম ফসফেট বা ডিএপি ব্যবহার করলে একই সঙ্গে ইউরিয়া ও ফসফরাসের অভাব পূরণ করা সম্ভব। জিংক সালফেট (মনো বা হেপ্টা) সার ফসফরাস জাতীয় সারের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানে জিংক সারের সর্বশেষ প্রযুক্তি চিলেটেড জিংক প্রয়োগ করা যেতে পারে। মূল জমিতে ধানের চারা রোপণের ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম লিবরেল জিংক স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে। রোপা আমন ধানের জমি তৈরির সময় বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৩০০ কেজি জৈব সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শতকরা ৩০ ভাগ কমানো সম্ভব।

জৈব বালাইনাশক ও এর ব্যবহার

জৈব উৎস বিশেষ করে উদ্ভিদ/উদ্ভিদাংশ থেকে উৎপন্ন বালাইনাশককে জৈব বালাইনাশক বলে। আমাদের দেশ আয়তনে ছোট হলেও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে খুবই সমৃদ্ধ। আবহমানকাল থেকেই মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় গাছ-গাছালি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি কৃষি ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণেও গাছ-গাছড়ার ব্যবহার ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের। সবুজ বিপ্লবের হাত ধরে ফসল উৎপাদনে বিপ্লব ঘটলেও রাসায়নিক উপকরণ বিশেষ করে রাসায়নিক বালাইনাশক যথেচ্ছ ব্যবহারে আমরা বর্তমানে এক জটিল পরিবেশ সমস্যার দুষ্টচক্রে বন্দী হয়ে পড়েছি। রাসায়নিক কৃষি উপকরণের এলোপাথাড়ি ব্যবহারের পার্শ্ব

প্রতিক্রিয়ায় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বাড়ছে দুষণের মাত্রা। জনস্বাস্থ্য হচ্ছে মারাত্বক হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য সারা পৃথিবীতে এখন জৈব কৃষির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। সে ধারাবাহিকতায় বালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। কারণ ,

১. উদ্ভিজ্জ বালাইনাশক পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না;

২. জৈব বালাইনাশকের প্রভাবে ক্ষতিকর পোকার বৃদ্ধি ব্যহত হলেও উপকারী পোকামাকড়ের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই;

৩. মাটির অণুজীব ও কেঁচোর উপর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই;

৪. মাছ, পাখি ও গবাদি পশুর উপর কোন বিষক্রিয়া নেই;

৫. জমিতে স্প্রে করার সাথে সাথে ফসল তোলা ও ব্যবহার করা যায়;

৬. জৈব বালাইনাশকের কোন দীর্ঘ মেয়াদী অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান থাকেনা বলে পরিবেশের জন্য নিরাপদ।

জৈব কৃষিতে কীটনাশকরূপে ব্যবহৃত গাছপালা:

ক্রমিক নং	গাছের নাম	গাছের কার্যকরী অংশ
০১.	ধতুরা	পাতা, কান্ড, ফুল, বীজ
০২.	ভেন্নার তেল	বীজ
০৩.	তামাক	পাতা
০৪.	পেঁপে	পাতা
০৫.	শিয়াল মুথা	পাতা, কান্ড, ফুল
০৬.	গ্লিরিসিজিয়া	পাতা, কান্ড, ফুল
০৭.	আফ্রিকান ধৈঞ্চা	মূল
০৮.	নিম	পাতা, কান্ড, ফুল, বীজ
০৯.	অড়হর	পাতা, ডাল, ফুল
১০.	তুলসী পাতা	পাতা, ডাল, ফুল
১১.	ক্লোরোডেনড্রাম	পাতা, ডাল, ফুল
১২.	মেক্সিকান গাঁদা	শিকড়, পাতা, ডাল, ফুল
১৩.	মেহগনী	বীজ
১৪.	কচু	পাতা. কান্ড
১৫.	নিশিন্দা	পাতা

ধানের পামরি পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

পামরী পোকা কালচে নীল রং এর এবং উজ্জল কার্টাযুক্ত। কীড়াগুলো অতি ক্ষুদ্র এবং হলদে ধরনের । বয়স্ক পোকার পাখায় কমলা বাদামী স্ট্রাইপ ও ঢেউ খেলানো অসংখ্য দাগ দেখা যায়। জীবনচক্রের স্তর চারটি (ডিম-৪-৬ দিন), লার্ভা (২১-২৮ দিন), পিউপা (৬-৭ দিন), পূর্ণাঙ্গ (৭-১০ দিন) জীবনকাল ৪৫-৫১ দিন, জীবনচক্র ২৪-২৯ দিন এবং বৎসরে কমপক্ষে ৪ বার বংশ বিস্তার করতে পারে। প্রতিটি স্ত্রীপোকা ৩-৪ দিনের মধ্যে প্রায় ৩০০ টি ডিম দেয়। বয়স্ক পোকার পাখায় কমলা বাদামী স্ট্রাইপ ও ঢেউ খেলানো অসংখ্য দাগ দেখা যায়।

আক্রমন মৌসুম: আমন মৌসুমে এর প্রাদূর্ভাব বেশী তবে আউশ ও বোরো মৌসুমেও এদের প্রাদূর্ভাব দেখা যায়।

অনুকুল পরিবেশ: উচ্চ তাপমাত্রা (২৫-৩০ ডিগ্রি সে:), উচ্চ আদ্রতা (৮০% উপরে), অতিরিক্ত বৃষ্টি, ক্রমাগত কয়েকদিন যাবত রাত্রের তাপমাত্রা উঠানামা, মৌসুমের শুরুতে ঘন বৃষ্টি পরে বৃষ্টির অভাব, বিকল্প পোষকের উপস্থিতি (আড়াইল, শ্যামা, আঙ্গুলী ঘাস)।

ক্ষতির লক্ষণ:

- ক্ষতিগ্রস্ত পাতায় শিরার সমান্তরালে লম্বালম্বি দাগ পড়ে।
- কীড়াগুলো পাতার দুই পর্দার মাঝে সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খাওয়ার ফলে পাতা শুকিয়ে যায়।
- বাড়ন্ত ধানের জমিতে আক্রমণ বেশী এবং ধান পাকার সময় থাকে না।
- পূর্ণবয়স্ক পোকা নতুন ধান ফসলে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে আক্রমণ করে।
- একটি কীড়া তার জীবনকালে ১২.৪ বর্গ মি মি: এবং একটি বয়স্ক পোকা প্রতিদিন ২৫ বর্গ মি.মি. পাতা খেতে পারে।

প্রতিকার:

- ধানের চারা পামরী পোকার ডিম, কীড়া এবং পূর্ণবয়স্ক পোকা মুক্ত থাকতে হবে।
- জমির মুড়ি ফসল না রাখা।
- আইল বা পার্শ্ববর্তী জায়গার আড়ালী ঘাস ও আগাছা নষ্ট করতে হবে।
- হাত জালের সাহায্যে বয়স্ক পোকা ধরে মাটিতে পুতে ফেলা।
- গাছে কুশী ছাড়ার শেষ সময় পর্যন্ত আক্রান্ত জমির পাতার গোড়ার ২.৫-৪.০০ সে: মি: রেখে বাকী অংশ কেটে মাটিতে পুতে ফেলা এতে পামরী পোকার কীড়া মেরে ফেলে পরবর্তী আক্রমণ রোধ করা যায়।
- শতকরা ৩৫ ভাগ পাতার ক্ষতি হলে অথবা প্রতি গোছা ধান গাছে ৪ টি পূর্ণবয়স্ক পোকা থাকলে রাসায়নিক দমনের সাহায্য নিবে।

রাসায়নিক দমন ব্যবস্থাপনা

- ইমিডাক্লোরোপ্রিড- টিডো/ইমিটাফ/বিলডর/বাম্পার/বিকোসিড/ইমপেল/ইমু/জাদীদ/গেইন/র‍্যালী/তেজ ।
- ম্যালাথিয়ন- ১.১২ লিটার/হেক্টর, ৪০০ মিলি / একর বা ২০ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ শতক জমির জন্য। ফাইফানন/ ফাইকম ম্যালাথিয়ন/ এ্যামকোমালা/ জি-থিয়ন/ পেসনন/ কিলথিয়ন/ ম্যালাটন/ মিথিয়ল। আইসোপ্রোকার্ব (এমআইপিসি)- ২৬ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ শতক জমি হারে। যেমন মিপসিন ৭৫ ডবিউপি।
- কার্বোসালফান ৫০০ মিলি/ একর বা ২২ মিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ শতক জমি হারে। যেমন মারশাল/ সানসালফান/ এডভানটেজ/ এমিটেজ/ বেনিফিট/ করসালফান/ ই-ফেন/ জেনারেল / টাচ।
- কার্বারিল- (ভিটাব্রিল ৮৫ ডবিউপি) বা ফেনোট্রোথিয়ন অথবা ফেনথিয়ন অথবা ডাইমেথোয়েট-৪০ ইসি (টাফগর/ বিষ্টারথোয়েট/ ডাইমেক্সিয়ন/ ডেল্টাথোয়েট/ ডপলারম্যাক্স/ ডাইমেগ্রো/ হোমোথোয়েট/ রগোর এল। ৪০০-৪৫০ মিলি/ একর বা ২০-২২ মিলি ১০ লিটার পানিতে ৫ শতক জমি হারে।

বস্তায় আদা চাষ পদ্ধতি

বস্তায় আদা চাষের জন্য আলাদা করে জমির দরকার নেই। অনেকের বাড়িতে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয় আবার অনেকেই এই পদ্ধতিতে আদা চাষ করার কথা জানেন না , আবার অতিবৃষ্টি বা বন্যায় ফসল ডুবে নষ্ট হওয়ার ভয়ও নেই। আবার একটি ফসল তোলার পর সেখানে আলাদা করে কোনো সার ছাড়াই আরেকটি ফসল ফলানো যাবে। খরচ নেই বললেই চলে!

অবিশ্বাস মনে হচ্ছে তো! না, এটা খুবই সম্ভব। এবং আপনার হাতের নাগালেই আছে সবকিছু। সিমেন্ট বা আলুর বস্তায় ফলানো যেতে পারে শাক–সবজি থেকে আদা–হলুদ!

এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মাটিবাহিত রোগের আক্রমণ অনেক কমে যায়, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে বস্তা অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। বাড়ির উঠোন, প্রাচীরের কোল ঘেঁষে বা বাড়ির আশেপাশের ফাঁকা জায়গা অথবা ছাদে যেখানে খুশি রাখা যায়। এর জন্যে আলাদা কোনও জমি বা পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না।

বিশেষ করে ছায়াযুক্ত জায়গাতে এই পদ্ধতিতে চাষ করতে পারেন। সাধারণত বাঁশবাগানের তলায় কোনও ফসল চাষ হয় না। ফলে জায়গাটা পড়েই থাকে। সেই বাঁশবাগানে বস্তায় আদা চাষ করতে পারেন।

চাষ পদ্ধতিঃ

প্রথমে মাটির শুকনো ঢেলা ভেঙে চেলে নিতে হবে। যাতে ঝুরঝুরে হয়। বস্তায় মাটি যাতে ফেঁপে থাকে সেজন্যে ভার্মিকম্পোস্ট ও ছাই মেশাতে হবে। পরিমাণমতো যোগ করতে হবে হাড়ের গুঁড়ো, গোবর সার। মাটি তৈরি হয়ে গেলে বস্তায় ভরে চাষের জন্যে বসাতে হবে ৭৫ গ্রামের একটি করে কন্দ। সামান্য জল দিতে হবে। এরপর বস্তার উপর ঢেকে দিতে পারলে ভালো হয়, তাতে মাটিতে আর্দ্রতা বেশিদিন থাকবে। অল্প দিনের মধ্যেই কন্দ থেকে গাছ বেরিয়ে আসবে।

বিস্তারিত পদ্ধতি

একটি বস্তায় তিন ঝুড়ি মাটি, এক ঝুড়ি বালি, এক ঝুড়ি পচা গোবর সার ও ২৫ গ্রাম ফিউরাডন লাগবে। বালি পানি নিষ্কাশনে সাহায্য করে, ফিউরাডন উইপোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করবে। মাটির সঙ্গে গোবর, বালি ও ফিউরাডন ভালোভাবে মিশিয়ে সিমেন্টের বস্তায় ভরে ঝাঁকিয়ে নিন তাতে মিশ্রনটি ভালোভাবে চেপে যাবে। আলাদা একটি বালি ভর্তি টবে তিন টুকরো অঙ্কুরিত আদা পুঁতে দিন। ২০-২৫ দিন পর ওই আদা থেকে গাছ বের হবে। তখন আদার চারা সাবধানে তুলে বস্তার মুখে তিন জায়গায় বসিয়ে দিন। দিনের অধিকাংশ সময় রোদ পায় এমন স্থানে বস্তাটি রাখতে হবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আদা গাছ বাড়তে থাকবে। চারা লাগানোর দু'মাস পরে চার চা চামচ সর্ষে খৈল এবং আধ চামচ ইউরিয়া প্রয়োগ করুন মাটিতে। মাঝে খুঁড়ে মাটিটা একটু আলগা করে দিলে ভালো হয়।

আদার কন্দ লাগানোর আগে ব্যাভিস্টিন দিয়ে শোধন করে নিলে ভালো হয়। এতে ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বাঁচবে। চাইলে অন্য কোনো ছত্রাকনাশকও ব্যবহার করতে পারেন। শোধনের পর আধা ঘণ্টা ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে।

আদার রোগ ও পোকামাকড়

রাইজম রট রোগঃ Pythium aphanidermatum (পিথিয়াম এফানিডারমেটাম) নামক ছত্রাকের আক্রমণের কারনে এ রোগ হয়। এ রোগ রাইজমে আক্রমণ করে বলে আদা বড় হতে পারে না ও গাছ দ্রুত মরে যায়।

লক্ষণঃ

প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে যায় কিন্তু পাতায় কোন দাগ থাকে না। পরবর্তীতে গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে মরে যায়। রাইজম (আদা) পচে যায় ও ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যায়। ভেজা ও স্যাঁত স্যাঁতে আবহাওয়ায় এ রোগ বেশী দেখা যায়। বর্ষাকাল বা জলাবদ্ধতা থাকলে এ রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এ রোগ বীজ, পানি ও মাটির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

ব্যবস্থাপনাঃ

#আক্রান্ত গাছ রাইজোমসহ সম্পূর্ণরূপে তুলে ধ্বং স করতে হবে।

#রোপণের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড বা ১ গ্রাম অটোস্টিন মিশ্রিত দ্রবণে বীজকন্দ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে ছায়ার নিচে শুকিয়ে রোপণ করতে হবে।

#সুষম সার ব্যবহার করতে হবে। একই জমিতে বার বার আদা চাষ করা যাবে না।

#কন্দ পচা রোগ দ্বারা আক্রান্তের প্রাথমিক পর্যায়ে কপার অক্সিক্লোরাইড ৫০% ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম বা রিডোমিল গোল্ড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে মাটির সংযোগ স্থলে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করে রোগ প্রতিরোধ করা যাবে।

পাতা ঝলসানো রোগ

প্রাথমিক অবস্থায় পাতায় ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। এসব দাগগুলোর মধ্যে ধূসর বর্ণ হয় এবং চারপাশে গাঢ় বাদামি আবরণ থাকে। রোগের প্রকোপ বেশি হলে দাগগুলো বড় হতে থাকে এবং একত্রিত হয়ে যায়।

প্রতিকারঃ

#বীজ লাগানোর সময় রোগ ও পোকা মুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

#প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে ২-৩ বার ১৫ দিন পরপর স্প্রে করা যেতে পারে।

ডগা বা কান্ড ছিদ্রকারী পোকাঃ কান্ড আক্রমণ করে বলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলে উৎপাদন কম হয়। এ পোকার মথ কমলা হলুদ রঙের এবং পাখার উপর কালো বর্ণের ফোটা থাকে। কীড়া হালকা বাদামি বর্ণের। গায়ে সুক্ষ্ম শুং থাকে।

লক্ষণঃ

পোকা কান্ড ছিদ্র করে ভিতরের দিকে খায় বলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। অনেক সময় ডেড হার্ট লক্ষণ দেখা যায়। আক্রান্ত কান্ডে ছিদ্র ও কীড়ার মল দেখা যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

ব্যবস্থাপনাঃ

পোকার আক্রমণ বেশি হলে, সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ২০ মিলি হারে প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়। অথবা ডারসবান বা ডাইমেক্রুণ প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যাবে। অথবা নুভাক্রন ১০০ ইসি ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

আদা সংগ্রহ

জুন-জুলাই মাসে আদা লাগালে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে তোলার উপযুক্ত হয়ে যাবে। এক একটি বস্তায় তিনটি গাছ থেকে এক-দেড় কেজি পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। আদা তুলে নেওয়ার পর সেখানে সবজি চাষ করা যেতে পারে। সে জন্যে নতুন করে মাটি তৈরি করারও দরকার নেই।

দেশি ফল চাষের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষের পুষ্টি ও সুষম খাবারের জন্য ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ফলের উৎপাদন হয় কৃষির মাধ্যমে। সুতরাং একটি সুস্থ জাতি বিনির্মাণে ফল চাষ সম্প্রসারণ তথা ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ফল ঔষধি গুণে সম্পৃক্ত বিধায় একে রোগ প্রতিরোধী খাদ্যও বলা হয়। ফলের উৎপাদন, বিপণন ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ অত্যন্ত শ্রমঘন কাজ বিধায় এগুলো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এভাবে দেশি ফল পুষ্টি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

নানা ধরনের দেশি ফল ও গুণাগুণ : আমাদের নিজ দেশে যেসব ফল উৎপাদন করা হয় সেই ফলগুলোকেই আমরা দেশি ফল বলে থাকি। এসব দেশি ফল পুষ্টিগুণ বা ঔষধি গুণেও পরিপূর্ণ।

দেশি ফল চাষের অবদান

যেহেতু দেশি ফল হতে আমরা নানা ধরনের পুষ্টিমূল্য পেয়ে থাকি তাই এর চাষ আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। **অধিক আয়** : অন্যান্য দানাদার খাদ্যশস্য অপেক্ষা দেশি ফলের গড় ফলন অনেক বেশি। সে হারে ফলের মূল্য বেশি হওয়ায় তুলনামূলকভাবে আয়ও অনেক বেশি যেমন- এক হেক্টর জমিতে ধান গম চাষে আয় হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। অথচ সমপরিমাণ জমিতে কলা ও আম চাষ করে যথাক্রমে আয় হয় ৭৫ হাজার ও ১ লাখ টাকা।

জাতীয় অর্থনীতিতে : বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ফলভিত্তিক আয়ের আনুমানিক প্রায় ১০ শতাংশ আসে ফল থেকে। এ থেকে বোঝা যায় জাতীয় অর্থনীতিতে তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ফল ও ফলদ বৃক্ষের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশি ফল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিমুখী সম্ভাবনা

বিশ্বের ফল বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবদান খুবই কম। বিদেশে টাটকা ও প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলের প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে সীমিত আকারে টাটকা ফল রপ্তানি হচ্ছে। রপ্তানিকৃত উল্লেখযোগ্য ফলগুলোর মধ্যে কাঁঠাল, আম, আনারস, লেবু, কামরাঙা, বাতাবিলেবু, তেঁতুল, চালতা উল্লেখযোগ্য। টাটকা ফল ছাড়াও হিমায়িত ফল (সাতকরা, কাঁঠাল বীজ, কাঁচকলা, লেবু, জলপাই, আমড়া ইত্যাদি) ইতালি, জার্মানি, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও বাহরাইনে রপ্তানি হচ্ছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের তথ্য বিবরণীতে দেখা যায়, ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যথাক্রমে ২২৪২ মেট্রিক টন, ১৫২৮.১৩ মেট্রিক টন, ২৬৯৪.৭০ মেট্রিক টন, ৫২০৩.৭০ মেট্রিক টন, ৫৪১১.২১ মেট্রিক টন এবং ১১৭৫৬.৬৩ মেট্রিক টন ফল রপ্তানি হয়, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে ফল রপ্তানিতে ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে ফল চাষ সম্প্রসারণ

বাংলাদেশে ফলের ব্যাপক বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এখানে প্রায় ৭০ ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফল জন্মে, যার ক্ষুদ্র একটি অংশ বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয়। বাংলাদেশে কাঁঠাল, আম, লিচু, লেবুজাতীয় ফল, আনারস, কলা, কুল, পেঁপে, পেয়ারা, নারিকেল প্রধান বা প্রচলিত ফল হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ফলের চাহিদা ২০০ গ্রামের বিপরীতে প্রাপ্যতা হলো মাত্র ৭৪.৪২ গ্রাম, সারা বিশ্বে ফল একটি আদৃত ও উপাদেয় খাদ্য। ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর এ পর্যন্ত উষ্ণ এবং অবউষ্ণম-লীয় অঞ্চলে চাষোপযোগী ৩০টি বিভিন্ন প্রজাতির ফলের ৬৫টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে যেগুলোর অধিকাংশ কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছে এবং দেশীয় ফলের চাষ সম্প্রসারণসহ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব উন্নত জাতের আরও ব্যাপক সম্প্রসারণ হওয়া অপরিহার্য।

ফল চাষ সম্প্রসারণে সমস্যাবলি

বাংলাদেশে ফল চাষে নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. কৃষকদের ফল চাষ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব।
২. গুণগত মানসম্পন্ন কলম-চারার অভাব।
৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের ফল চাষ সম্পর্কিত জ্ঞানের অপ্রতুলতা।
৪. গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ ও বিএডিসির সমন্বয়ের ঘাটতি।
৫. ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারিতে ফলের উন্নত জাতের মাতৃগাছের অভাব।
৬. উন্নত জাতের গুণগত মানসম্পন্ন কলম-চারা উৎপাদনের জন্য সঠিক জ্ঞানের অভাব।
৭. উন্নত উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞানের অভাব।
৮. অধিকাংশ ক্ষেত্রে বীজ থেকে ফল গাছ হওয়ায় ফলের ফলন ও গুণগতমান উভয়ই নি¤Áমানের হয়।
৯. বাংলাদেশের চাষের জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।
১০. ফল পচনশীল বিধায় সংগ্রহোত্তর সঠিক পরিবহন ব্যবস্থা, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে কৃষক প্রায়ই ন্যায্যমূল্য পায় না বিধায় প্রায় ২৫ শতাংশ ফল সংগ্রহোত্তর নষ্ট হয়ে যায়।
১১. বছরের কিছু সময় (মে-আগস্ট) ফলের সমারোহ থাকলেও অবশিষ্ট সময়ে (সেপ্টেম্বর-এপ্রিল) দেশীয় ফলের প্রাপ্যতা থাকে খুবই কম।
১২. ফল বৃক্ষের বাগান তৈরিতে উৎসাহ কম।
১৩. অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশ ও বৈরী আবহাওয়াগত কারণে ফলন কম হয়।
১৪. প্রচলিত ফলের পাশাপাশি অপ্রচলিত ফল চাষ তেমন গুরুত্ব পায় না তাই দেশ থেকে অনেক ফল বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
১৫. পাহাড়ি জমিতে ফল চাষ করা কষ্টকর বিধায় তা চাষের আওতায় আসছে না।
১৬. ফল গাছ রোপণের পর ফল আসতে দীর্ঘ সময় লাগে বিধায় অনেকে ফল চাষে আগ্রহী হয় না।

ফল চাষ সম্প্রসারণে করণীয়

১. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে ফল চাষ করার মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।
২. উন্নতজাতের গুণগত মানসম্পন্ন কলম-চারা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকরা তা সহজলভ্য করতে পারবে।
৩. ফল চাষ বিষয়ে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা-বৃদ্ধি পাবে, যা দেশে ফল চাষের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
৪. প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলের উন্নত জাতের মানসম্পন্ন কলমের চারা নিজস্ব নার্সারিতে উৎপাদন ও বিপণন করতে হবে।
৫. ব্যক্তিকে উন্নত জাতের মাতৃগাছের বাগান তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৬. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নার্সারিম্যান ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৭. ফলের উন্নত টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে সারা দেশে ফলচাষিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে।
৮. ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে ফল চাষ হচ্ছে এমন সব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম ফলনশীল জাত পরিবর্তন করা।
৯. বাংলাদেশে পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর পতিত জমি রয়েছে যেখানে অনায়াসেই উন্নত জাতের ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।
১০. ফল দ্রুত পচনশীল বিধায় এর সংগ্রহোত্তর অপচয় (২৫ থেকে ৪০ শতাংশ) রোধ করা ও সঠিক গুণগত মান বজায় রাখার জন্য লাগসই উন্নতমানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
১১. আমাদের দেশে বছরের কিছু সময় (মে-আগস্ট) দেশের ফলের ৬১ ভাগ উৎপাদিত হওয়ায় ফলের বিপুল সমারোহ লক্ষ করা যায়। এ সময় তা পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

মাল্টা বাগানের পরিচর্যা

চারার যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময় মত সঠিক পরিমান ও পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে।

বয়স ভেদে গাছ প্রতি সার প্রয়োগের পরিমান নিম্নরুপ–

১-২ বছর, গোবর ১০-১২ কেজি, ইউরিয়া ২০০-৩০০ গ্রাম, টিএসপি ১০০-১৫০ গ্রাম, এমওপি ১০০-১৫০ গ্রাম, জিংক ১০ গ্রাম ও বরিক ৫ গ্রাম।

৩-৪ বছর, গোবর ১২-১৫কেজি, ইউরিয়া ৩০০-৪৫০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০-২০০গ্রাম, এমওপি ১৫০-২০০, জিংক ১৫গ্রাম ও বরিক এসিড ৮ গ্রাম।

৫-৭ বছর, গোবর ১৫-১৮কেজি, ইউরিয়া ৪৫০-৬০০গ্রাম, টিএসপি ২০০-৩০০গ্রাম, এমওপি ২০০-২৫০গ্রাম ,জিংক ২০গ্রাম ও বরিক ১০ গ্রাম।

৮-১০ বছর, গোবর ১৮-২০কেজি, ইউরিয়া ৬০০-৭০০গ্রাম, টিএসপি ৩০০-৪৫০গ্রাম, এমওপি ২৫০-৩০০গ্রাম, জিংক ২৫গ্রাম ও বরিক ১২গ্রাম।

১০ বছর এর বেশী, গোবর ২০-২৫কেজি, ইউরিয়া ৭৫০গ্রাম, টিএসপি ৫০০গ্রাম, এমওপি ৪৫০গ্রাম, জিংক ৩০ গ্রাম ও বরিক এসিড ১৫ গ্রাম।

প্রতি বসর মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (মার্চ) এবং মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে বর্ষার পূর্বে ২ বার ও বর্ষার পরে মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে ১ বার মোট তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে সেচের ব্যাবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে ২ কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভালো।

আগাছা দমনঃ

বর্ষার পরে সার প্রয়োগের পর গাছের গোঁড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমন সহ শুষ্ক মৌসুমে আদ্রতা সংরক্ষিত হয়।

সেচঃ

ভালো ফলের জন্য শুষ্ক মৌসুমে বা খরার সময় নিয়মিত সেচ দেয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোঁড়ায় যেন পানি না জমে, সে জন্য দ্রুত নিষ্কাশন ব্যাবস্থা করতে হবে।

ডাল-পালা ছাঁটাইঃ

মাল্টা গাছের জন্য ডালা ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পরে ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডালা ছেঁটে গাছকে নিদিষ্ট আকার দিতে হবে, যাতে গাছ উচু না হয়ে চারদিকে ছড়াতে পারে। কারন পার্শ্ব ডালে ফল বেশী ধরে। কান্ডের এক মিটার উচ্চতার সকল ডালা ছাঁটাই করতে হবে। ডালা ছাঁটাইয়ের পরে কাঁটা অংশে বোর্দো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া পানি তেউড় বা water sucker উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা, রোগাক্রান্ত ডালা ছেঁটে ফেলতে হবে।

ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিংঃ

মাল্টা গাছে থোকা থোকা ফল ধরে .আর বারী মাল্টা ১ জাতের গাছে প্রতি বসর প্রচুর ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল ছোট ও নিম্ন মানের হয়। এজন্য প্রতি পুস্প মঞ্জুরিতে সুস্থ্য ও সবল দেখে দুটি ফল রেখে, বাকীগুলো ছোট (মার্বেল আকৃতি) থাকা অবস্থায় ছাঁটাই করে দিতে হবে। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বসর থেকে ফল দেয়া শুরু করে। গাছের ভালো বৃদ্ধির জন্য প্রথম ২ বসর ফল না রাখাই ভালো। ফলের আকৃতি সবুজ হওয়ায় পাখি বা পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্কতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অবাঞ্ছিত পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহঃ

ফলের পরিপক্কতার সাথে সাথে ফলের গাড় সবুজ বর্ণ, হালকা সবুজ বর্ণে বা ফ্যাঁকাসে সবুজ হতে থাকে। বারী মাল্টা- ১ সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে আহরন করা যায়। ফল সংগ্রহের পর নষ্ট বা আঘাত প্রাপ্ত ফল আলাদা করতে হবে। ভালো মানের ফল গুলো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

পেয়ারার এনথ্রাক্সনোজ বা ক্ষত রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

রোগের নামঃ

পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ বা ক্ষত রোগ Anthracnose of Guava

রোগের কারণঃ

Colletotrichum gloeosporioides নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণঃ

- এ রোগ কান্ড, শাখা, প্রাশাখা পাতা ও ফলে আক্রমণ করে।
- প্রথমে পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায়।

- ধীরে ধীরে দাগ বেড়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে।
- পরিপক্ক ফল ফেটে যায়।
- পাতায় কালো দাগ পড়ে এবং কচি কান্ড আগা থেকে শুকিয়ে মরে যায়।
- ছোট-বড় যে কোন বয়সের গাছ আগা থেকে মরতে পারে যা ডাইব্যাক নামে পরিচিত।
- কচি ও পাকা ফল রোগাক্রান্ত হতে পারে। ফলে গোলাকার উঁচু কালো দাগ হয়, ফল ফেটে যায় ও অধিকাংশ সময় পচে যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- গাছের নিচের ঝরে পড়া পাতা, ফল সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলা।
- আক্রমণ বেশী হলে পেয়ারার কুঁড়ি আসার আগে প্রতি লিটার পানিতে কার্বেন্ডাজিম ০১ গ্রাম বা ০.৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি মিশিয়ে মৌসুমে ৩/৪ বার ১৫ দিন পর স্প্রে করা।
- ফল সংগ্রহের পর গাছের মরা ডালপালা ছাঁটাই করা।
- বছরে তিন ভাগে সুষম সার (নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাসিয়ামঃ ২৩০-২৪০-৩০০ গ্রাম/গাছ) প্রতি গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা।
- গাছে পেয়ারার ফুল আসার আগে আগে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক নোইন (০.১%) স্প্রে করা এবং ১৫ দিন পর আরো দুইবার স্প্রে করা।

পেয়ারার মাছি পোকা ও স্কেল/খোসা পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

পোকার নাম : পেয়ারার মাছি পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : লালচে বাদামি মাছির ঘাড়ে হলুদ দাগযুক্ত রেখা আছে। পাখা স্বচ্ছ। পাখার নিচের দিকের কিনারায় কালো দাগ আছে। পেট মোটা, স্ত্রী মাছির পেছনে সরু ও চোখা ডিম পাড়ার সুঁইয়ের মতো নল আছে। ডিম সাদা নলের মতো এবং এক দিকে বাঁকা।

ক্ষতির ধরণ : ক্রীড়া ছিদ্র করে ফলের ভিতরে ঢুকে ফলের মাংসল অংশ খেতে থাকে এবং ফল ভেতরে পচে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সব

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

মাছি পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য সহজ উপায় হল ফলন্ত গাছে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ঝুলানো। পোকা দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন।কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পেয়ারার স্কেল/খোসা পোকা

পোকা চেনার উপায়

২-৩ মি.মি. ডিম্বাকৃতির বাদামি থেকে ধূসর রঙের পোকা বাচ্চাসহ দলবেধে গাছের ডালে শক্ত করে লেগে থাকে। খোলস আঁশের মতো।

লক্ষণ

১। পোকা পাতা ও ডালের রস চুষে খেয়ে ফেলে ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়।

২। পোকা সাধারণত পাতা, ফল ও ডালে আক্রমণ করে এবং সাদা সাদা তুলার মত দেখা যায়।

৩। অনেক সময় পিপড়া দেখা যায় গাছে।

৪। পোকার আক্রমণে অনেক সময় পাতা ঝরে যায় এবং ডাল মরে যায়।

প্রতিকার

১। আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে দ্রুত সম্ভব ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

২। অল্প আক্রমণের ক্ষেত্রে তুলায় সমান্য অ্যালকোহল লাগিয়ে সেটি দিয়ে ঘষে গাছ পরিস্কার করলে আক্রমণ কমানো সম্ভব।

৩। সম্ভব হলে হাত দিয়ে ডিম ব বাচ্চার গাদা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

৪। জৈব বালাইনাশক নিমবিসিডিন (০.৪%) ব্যবহার করে পোকা দমন করা যায়।

৫। আক্রমণ বেশী হলে প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলি রগর টাফগর, সানগর বা সুমিথিয়ন ২ মিলি মিপসিন বা সপসিন মিশিয়ে বিকেলে স্প্রে করলে পোকা মরে যায়।

উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি ও এর অভাবজনিত লক্ষণসমূহ

গাছের বৃদ্ধির ও উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়। এর কোন একটির অভাব হলে গাছের বৃদ্ধি ভাল ভাবে হয় না। এমন কি গাছ মারা যেতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় ১৬ টি উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ কোনো কোনো উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে, আবার কোনো কোনো উপাদান সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান।

ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান (macro-nutrient বা macro-element): উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান বেশি পরিমাণে দরকার হয়, সেগুলোকে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রো উপাদান বলা হয়। ম্যাক্রো উপাদান ১০ টি, যথা: নাইট্রোজেন (N), পটাশিয়াম (K), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), সালফার (S) এবং লৌহ (Fe)।
(মনে রাখার উপায়: MgK CaFe for Nice CHOPS)

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান (micro-nutrient বা micro-element): উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদেরকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রো উপাদান বলে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ৬ টি, যথা: দস্তা বা জিংক (Zn), ম্যাংগানিজ (Mn), মোলিবডেনাম (Mo), বোরন (B), তামা বা কপার (Cu) এবং ক্লোরিন (Cl)।

নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণঃ

- গাছের পাতা হালকা সবুজ ও হলদে হয়ে যায়।
- প্রাথমিক পর্যায়ে পুরো জমির ধান গাছ হলদে দেখায়।
- বেশি অভাবে গাছের পাতা হলদে বাদামী হয়ে যায়।
- দানা জাতীয় ফসলের কুশি ও শীষের সংখ্যা কম হয়।
- ফুল ও ফলের আকার ছোট হয়।
- ফল ও গাছের পাতা ছোট হয় এবং শুকিয়ে যায়।
- গাছের পার্শ্ব কুঁড়ি শুকিয়ে যায়।
- গাছের অন্যান্য উপাদানের পরিশোষণের হার কমে যায়।

ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণঃ

- ধান গাছের পাতা খাড়া হয়, পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণ থাকে।
- ফসফরাসের অভাবে গাছের কান্ড ও মূলের বৃদ্ধি হয় না।
- উদ্ভিদের কোষ বিভাজন হার কমে যায়।
- গাছে পাতা ছড়ানো থাকে (বাধাকপি) অর্থাৎ বাধাকপি পাতা বাঁধে না।
- উদ্ভিদে আমিষের পরিমাণ কমে যায়।
- ফুলের ও ফলের সংখ্যা কম হয় এবং আকারে ছোট হয়।
- গাছে ফুল ফল হয় না।
- বেগুনের পাতা নীলাভ হয় কিন্তু ফল ধরে না।
- দানা জাতীয় ফসলে চিটা বেশি হয়।
- বাধাকপি/ফুলকপি ফুল ও বীজ হয় না।

পটাশিয়ামের ঘাটতিজনিত লক্ষণঃ

- গাছের পাতার কিনারা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়।
- উদ্ভিদ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়।
- উদ্ভিদে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বাড়ে।
- পুরা জমিতে ধানের পাতা বাদামি হয়ে যায়।

- সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়।
- গাছ সামান্য খরাতেই নেতিয়ে পড়ে।
- গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, তবে পাতা সবুজ থাকে।
- গাছের পাতা বাদামি বর্ণ ধারণ করতে থাকে।
- শিকড়ের বৃদ্ধি ঘটে না।
- অধিক ঘাটতিতে পাতা বিবর্ণ ও বাদামি হয়ে যায়।
- পাতার উপর মরা দাগ পড়ে।
- টমেটো ফেটে যায়।

ক্যালশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণঃ

- কচি পাতার অগ্রভাগ মুড়িয়ে থাকে।
- গাছের ডগায় বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
- বেগুনের পাতায় কুঁকড়ে যাওয়ার মত দেখায়।
- পাতা ও কান্ডের ভঙ্গুরতা বেড়ে যায়।
- গাছ টান দিলে সহজেই মাটি থেকে শিঁকড় ছিড়ে উঠে আসে।
- মরিচের ও ফুলকপির পাতা মুড়িয়ে যায়।
- ডাল ফসলের ফলন কমে যায়।
- শিমের পাতা বিকৃত হয়ে যায়।

ম্যাগনেশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণঃ

- গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।
- গাছের আন্তঃশিরাস্থান সমূহ বিবর্ণ হয়ে যায়।
- ফলের আকার ছোট হয়।
- আখ গাছের পাতার সংখ্যা কম হয়।
- গোল আলুতে সালোক-সংশ্লেষণের হার খুবই কমে যায়।
- গাছ সজীবতা ও উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে।
- ডাল ফসলে গুটির সংখ্যা কমে যায়।
- দানার আকার ছোট হয়।
- রোগ, পোকার আক্রমণ বেড়ে যায়।

সালফারের অভাবজনিত লক্ষণঃ

- গাছের কচিপাতা হলদে হয়। পরবর্তীতে পুরাতন পাতা হলদে হতে থাকে।
- উদ্ভিদ কোষের বিভাজন বিঘ্নিত হয়ে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।
- গাছের আকার খর্ব হয়।
- জমিতে গাছ হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে।
- গাছের কান্ডে সজীবতার বদলে শুস্কতা দেখা দেয়।
- তোলা শাক-সবজি অল্প সময়ের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে।
- ধানের কচি পাতা বিবর্ণ হয়।
- ফসলের পরিপক্কতা বিলম্বিত হয়।
- তৈলবীজ জাতীয় ফসলেন ফলন কমে যায়।
- সরিষা গাছে ফলের সংখ্যা কম হয়।
- পেঁয়াজের আকার ছোট হয়।